أعوذ باللّٰه من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book#.71) www.motaher21.net

لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ؕ

"মুসলিম ও কাফির পরস্পর বিবাহ বন্ধনে থেকো না।"

" No marriage between Believer and Unbelievers."

সুরা: আল-মুমতাহিনাহ

আয়াত নং :- ১০

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ ۚ فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ ؕ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَ لَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ ۫ وَ اٰتُوْهُمْ مَّآ اَنْفَقُوْا ؕ وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ؕ وَ لَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَ سْـَٔلُوْا مَآ اَنْفَقْتُمْ وَ لْيَسْـَٔلُوْا مَآ اَنْفَقُوْا ؕ ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ ؕ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

হে ঈমানদাররা, ঈমানদার নারীরা যখন হিজরাত করে তোমাদের কাছে আসবে তখন (তাদের ঈমানদার হওয়ার বিষয়টি) পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নাও। তাদের ঈমানের প্রকৃত অবস্থা অবশ্য আল্লাহই ভাল জানেন। অতঃপর যদি তোমরা বুঝতে পার যে, তারা সত্যিই ঈমানদার তাহলে তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিও না। না তারা কাফেরদের জন্য হালাল না কাফেররা তাদের জন্য হালাল। তাদের কাফের স্বামীরা তাদেরকে যে মোহরানা দিয়েছে তা তাদের ফিরিয়ে দাও। তাদেরকে মোহরানা দিয়ে বিয়ে করায় তোমাদের কোন গোনাহ হবে না। আর তোমরা নিজেরাও কাফের নারীদেরকে নিজেদের বিয়ের বন্ধনে আটকে রেখো না। নিজেদের কাফের স্ত্রীদের তোমরা যে মোহরানা দিয়েছ তা ফেরত চেয়ে নাও। আর কাফেররা তাদের

মুসলমান স্ত্রীদের যে মোহরানা দিয়েছে তাও যেন তারা ফেরত চেয়ে নেয়। এটি আল্লাহর নির্দেশ। তিনি তোমাদের সবকিছুর ফায়সালা করেন। আল্লাহ জ্ঞানী ও বিজ্ঞ।

১০ নম্বর আয়াতের তাফসীর :

আলোচ্য আয়াতগুলো একটি বিশেষ ঘটনা অর্থাৎ হুদায়বিয়ার সন্ধির সাথে সম্পর্কযুক্ত। হাদীসে এসেছে, "যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্ধি চুক্তি শেষ করলেন তখন তিনি সাহাবায়ে কিরামকে বললেন, তোমরা উঠ এবং উটগুলোর "নাহর' বা রক্ত প্রবাহিত কর তারপর মাথা কামিয়ে ফেল। কিন্তু তাদের কেউই এটা শুনছিল না। শেষপর্যন্ত রাসূল এটা তিনবার বললেন। কিন্তু কেউ না শুনাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে সালামাহ এর কাছে গিয়ে তা বিবৃত করলেন। উম্মে সালামাহ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি কি এটা বাস্তবে হওয়া চান? তবে আপনি কাউকে কিছু না বলে নিজের উটটি "নাহর' করুন এবং আপনার মাথা কামানোর জন্য লোক ডেকে তা সম্পাদন করুন। তিনি তাই করলেন। ফলে সবাই তা করতে শুরু করে দিল। আর তখনই কয়েকজন মুমিন নারী এসে উপস্থিত। তখন আল্লাহ্ তা'আলা

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ

এই আয়াত নাযিল করলেন।" [বুখারী: ২৩৭২] এর কারণ হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মক্কাবাসীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হুদায়বিয়ার বিখ্যাত শান্তিচুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল এই যে, মক্কা থেকে কোন ব্যক্তি মদিনায় চলে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিবেন যদিও সে মুসলিম হয়। কিন্তু মদীনা থেকে কেউ মক্কায় চলে গেলে কোরাইশরা তাকে ফেরত পাঠাবে না। এই শর্তের ভাষা ছিল ব্যাপক, যাতে পুরুষ ও নারী উভয়ই বাহ্যত অন্তর্ভুক্ত ছিল। অর্থাৎ কোন মুসলিম পুরুষ অথবা নারী মক্কা থেকে মদীনায় চলে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ফেরত পাঠাবেন। এই চুক্তি সম্পাদন শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হুদায়বিয়াতেই অবস্থানরত ছিলেন তখন মুসলিমদের জন্যে অগ্নি পরীক্ষাতুল্য একাধিক ঘটনা সংঘটিত হয়ে যায়। তন্মধ্যে একটি ঘটনা হচ্ছে, সুবাই'আ বিনতে হারেস আল-আসলামিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহা কাফের সায়ফী ইবনে রাহিবের পত্নী ছিলেন। তখন পর্যন্ত মুসলিম ও কাফেরের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম ছিল না। এই মুসলিম মহিলা মক্কা থেকে পালিয়ে হুদাইবিয়ায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত হলেন। সাথে সাথে স্বামীও হাযির। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে দাবি জানাল যে, আমার স্ত্রীকে আমার কাছে প্রত্যার্পণ করা হোক। কেননা, আপনি এই শর্ত মেনে নিয়েছেন এবং চুক্তিপত্রের কালি এখনও শুকায়নি। [তাফসীরে কুরতুবী: ২০/৪১০]

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। এসব আয়াতে প্রকৃতপক্ষে মুসলিম ও কাফেরদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ ও হারাম করা হয়েছে। এর পরিণতিতে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, কোন মুসলিম নারী হিজরত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে পৌছে গেলে তাকে

কাফেরদের হাতে ফেরত দেয়া হবে না সে পূর্ব থেকেই মুসলিম হোক; -যেমন উল্লেখিত ভদ্রমহিলা, অথবা হিজরতের পর তার মুসলিমতত্ব প্রমাণিত হোক। তাকে ফেরত না দেয়ার কারণ এই যে, সে তার কাফের স্বামীর জন্যে হালাল নয়। উল্লেখিত আয়াতসমূহ অবতরণের ফলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, চুক্তিপত্রের উপরোক্ত শর্তটি ব্যাপক অর্থে প্রযোজ্য নয় যে, এই শর্তটির ব্যাপকতা কেবল পুরুষদের ক্ষেত্রে গ্রহণীয়-নারীদের ক্ষেত্রে নয়। আয়াতের ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুক্তিপত্রের উল্লেখিত এই শর্তের সঠিক মর্ম ব্যাখ্যা করেন এবং তদনুযায়ী সুবাই'আ রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে কাফেরদের কাছে ফেরত প্রেরণে বিরত থাকেন। কোন কোন বর্ণনায় অনুরূপ ঘটনা উম্মে কুলসুম বিনতে-উকবার ক্ষেত্রেও ঘটেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে । [বুখারী: ২৭১১, ২৭১২]

আয়াতে মুহাজির নারীকে পরীক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। সে পরীক্ষা কি ছিল এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত বর্ণিত আছে, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, মুহাজির নারীকে শপথ করানো হত যে, সে স্বামীর প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণার কারণে আগমন করেনি, মদীনার কোন ব্যক্তির প্রেমে পড়ে আসেনি এবং অন্য কোন পার্থিব স্বার্থের বশবর্তী হয়ে হিজরত করেনি; বরং একান্তভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসা ও সন্তুষ্টি লাভের জন্যে আগমন করেছে। যে নারী এই শপথ করত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে মদীনায় বসবাসের অনুমতি দিতেন এবং সে তার স্বামীর কাছ থেকে যে মোহরানা ইত্যাদি আদায় করেছিল, তা তার স্বামীকে ফেরত দিয়ে দিতেন। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, পরীক্ষা ছিল, কালেমা শাহাদাত বলা অর্থাৎ আশাহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়া আশাহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বলা। তবে এখানে গ্রহণযোগ্য মত হলো, যা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নারীদের পরীক্ষার পদ্ধতি ছিল সেই আনুগত্যের শপথ, যা পরবর্তী আয়াতসমূহে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে;

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ۙ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

মুহাজির নারীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাতে আয়াতে বর্ণিত বিষয়সমূহের শপথ করত। তিরমিযী: ৩৩০৬, অনুরূপ বর্ণনা দেখুন, বুখারী: ৪১৮২, ৪৮৯১, মুসলিম: ১৮৬৬, মুসনাদে আহমাদ: ৬/২৭০]

এই নির্দেশের পটভূমি হলো, হুদাইবিয়ার সন্ধির পর প্রথম মুসলমানরা মক্কা থেকে পালিয়ে মদীনায় এসে হাজির হতে থাকল এবং সন্ধির শর্ত মোতাবেক তাদেরকে যথারীতি ফেরত পাঠান হতে থাকল। এরপর মুসলিম নারীদের আগমণ শুরু হলো এবং সর্বপ্রথম উম্মে কুলসূম বিনতে উকবা ইবনে আবু মু'আইত হিজরত করে মদীনায় এসে পৌঁছলেন। কাফেররা চুক্তির কথা বলে তাকেও ফিরিয়ে দেয়ার দাবী জানাল। উম্মে কুলসূমের দুই ভাই ওয়ালীদ ইবনে উকবা এবং উমারা ইবনে উকবা তাকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য মদীনায় হাজির হলো।

তখন এ মর্মে প্রশ্ন দেখা দিল যে, হুদাইবিয়ার সন্ধি নারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে কি না? এখানে আল্লাহ তা'আলা এ প্রশ্নেরই জবাব দিয়ে বলেছেনঃ যদি সে মুসলমান হয় এবং নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে সে ঈমানের জন্যই হিজরত করে এখানে এসেছে অন্য কিছু তাকে এখানে আনেনি, তাহলে তাকে ফেরত পাঠান যাবে না।

এক্ষেত্রে হাদীসের শুধু ভাবার্থ বর্ণনা করার কারণে বড় রকমের একটা জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে যার সমাধান হওয়া আবশ্যক। হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্তাবলী সম্পর্কে হাদীসমূহে আমরা যেসব বর্ণনা দেখতে পাই তার অধিকাংশই ভাবার্থের বর্ণনা। আলোচ্য শর্ত সম্পর্কিত কোন বর্ণনার ভাষা হলোঃ

-مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا

"তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি যদি আমাদের কাছে চলে আসে তাকে আমরা ফেরত পাঠাব না। কিন্তু আমাদের মধ্য থেকে কেউ তোমাদের কাছে চলে গেলে তাকে তোমরা ফিরিয়ে দেবে।"

কোন বর্ণনার ভাষা হলোঃ

-مَنْ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَصْحَابِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ رَدَّهُ عَلَيْهِ

"রসূলুল্লাহর ﷺ কাছে তাঁর সাহাবীদের কেউ যদি তার অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে আসে তাহলে তিনি ফেরত পাঠাবেন।"

আবার কোন বর্ণনাতে আছেঃ

-مَنْ أَتَى مُحَمَّدًا مِنْ قُرَيْشٍ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ رَدَّهُ عَلَيْهِ

"কুরাইশদের কোন ব্যক্তি যদি তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে চলে যায় তাহলে তিনি তাকে কুরাইশদের কাছে ফেরত পাঠাবেন।"

এসব রেওয়ায়াতের বর্ণনার ধরন থেকে আপনা আপনি এ কথা প্রকাশ পায় যে, মূলত চুক্তিতে সন্ধির শর্ত যে ভাষায় লেখা হয়েছিল এসব বর্ণনায় তা হুবহু উদ্ধৃত হয়নি। বরং বর্ণনাকারীগণ তার বিষয়বস্তু নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। আর বহু সংখ্যক রেওয়ায়াত যেহেতু এই প্রকৃতির তাই মুফাস্সির ও মুহাদ্দিসগণ বুঝে

নিয়েছেন যে, চুক্তির মধ্যে সাধারণভাবে নারী ও পুরুষ উভয়ই অন্তর্ভুক্ত এবং চুক্তি অনুসারে নারীদের ফেরত পাঠানো কর্তব্য ছিল। কিন্তু পরক্ষণেই যখন তারা আল্লাহ তা'আলার এ নির্দেশ দেখতে পেলেন যে, ঈমানদার নারীদের ফেরত পাঠান যেন না হয়, তখন তাঁরা এর ব্যাখ্যা করলেন যে, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার নারীদের ক্ষেত্রে অন্তত চুক্তি ভঙ্গের ফায়সালা ও নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু এটা সহজভাবে গ্রহণ করার মত কোন মামুলী বক্তব্য নয়। সন্ধি যদি প্রকৃতপক্ষে পুরুষ ও নারী নির্বিশেষে সবার জন্য সাধারণভাবে প্রযোজ্য হয়ে থাকে তাহলে একপক্ষ এক তরফাভাবে তাতে সংশোধনী যোগ করবে কিংবা নিজেদের পক্ষ থেকে তার কোন অংশ পরিবর্তন করে ফেলবে তা কি করে বৈধ হতে পারে? আর এরূপ করা হয়েছিল বলে যদি ধরেও নেয়া হয় তাহলে বড় বিস্ময়ের ব্যাপার হলো এই যে, কুরাইশরা এর কোন প্রতিবাদই করল না। কুরাইশরা তো রসূলুল্লাহ ﷺ এবং মুসলমানদের প্রতিটি কথার সমালোচনা করার জন্য সর্বদা এক পায়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তিনি সন্ধির শর্তাবলী স্পষ্ট লংঘন করেছেন এমন প্রমাণ পেশ করার সুযোগ পেলে তো তারা চিৎকার করে আসমান মাথায় তুলে নিত। কিন্তু কোন বর্ণনা থেকেই আমরা এ বিষয়ে আভাস পর্যন্ত পাই না যে, কুরআনের এই ফায়সালার বিরুদ্ধে তারা সামান্যতম আপত্তি ব প্রতিবাদ করেছে। এটি ছিল এমন একটি প্রশ্ন, যে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র চিন্তা করা হলেও চুক্তির মূল ভাষা অনুসন্ধান করে এই জটিলতার সমাধান পেশ করার চেষ্টা করা হতো। কিন্তু অনেকে এদিকে লক্ষ্যই করেননি। কেউ কেউ (যেমন কাযী আবু বকর ইবনে আরবী) লক্ষ্য করলেও তাঁরা কুরাইশদের আপত্তি ও প্রতিবাদ না করার কারণ হিসেবে এরূপ ব্যাখ্যা পর্যন্ত করতে দ্বিধা করেননি যে, আল্লাহ তা'আলা মু'জিযার মাধ্যমে এ ব্যাপারে কুরাইশদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এ ধরনের ব্যাখ্যার পেশ করে তাঁরা কিভাবে সন্তুষ্ট হতে পারলেন তা ভেবে বিস্মিত হতে হয়।

আসল কথা হলো, সন্ধি চুক্তির এই শর্তটি মুসলমাদের পক্ষ থেকে নয়, কুরাইশদের পক্ষ থেকে পেশ করা হয়েছিল। তাদের পক্ষ থেকে তাদের প্রতিনিধি সুহাইল ইবনে আমর চুক্তিপত্রে যে ভাষা লিপিবদ্ধ করেছিল তা ছিলঃ

-عَلَى اَنْ لَايَأْتِيْكَ مِنَّا رَجُلٌ وَاِنْ كَانَ عَلَى دِيْنِكَ اِلَّا رَدَدْتَهُ اِلَيْنَا

"আমাদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে কোন পুরুষও যদি আসে আর সে যদি তোমাদের ধর্মের অনুসারীও হয় তাহলেও তোমরা তাকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেবে।"

চুক্তির এই ভাষা বুখারী "কিতাবুশ্ শুরুতে বাবুশ শুরুত ফিল জিহাদ ওয়াল মুসালাহ" অনুচ্ছেদে মজবুত সনদে উদ্ধৃত হয়েছে। সুহাইল হয়তো 'রাজুল' (رجل) শব্দটি ব্যক্তি অর্থে ব্যবহার করেছিল। কিন্তু এটি তার চিন্তা ও মন-মস্তিষ্ক পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। চুক্তিপত্রে রাজুল শব্দটিই লেখা হয়েছিল আরবী ভাষায় যা পুরুষদের বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাই উম্মে কুলসুম বিনতে উকবার প্রত্যার্পণের দাবী নিয়ে তার ভাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলে (ইমাম যুহরীর বর্ণনা অনুসারে) রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ফেরত পাঠাতে অস্বীকৃতি জানালেন। তিনি যুক্তি দেখিয়ে বললেনঃ كان الشرط فى الرجال دون النساء এ শর্ত শুধু পুরুষদের ব্যাপারে ছিল মেয়েদের ব্যাপারে ছিল না। (আহকামুল কুরআন---ইবনে আরাবী, তাফসীরে

কাবীর-ইমাম রাযী) তখন পর্যন্ত খোদ কুরাইশরাও এই ভুল ধারণার মধ্যে ছিল যে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব ধরনের মুহাজিরদের বেলায় এ চুক্তি প্রযোজ্য। কিন্তু নবী (সা.) যখন চুক্তির এই ভাষার প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তখন তারা হতবাক ও লা-জওয়াব হয়ে গেল এবং বাধ্য হয়েই তাদেরকে এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হলো।

যে কোন স্ত্রীলোক মক্কা ছেড়ে মদীনায় আসুক না কেন এবং যে উদ্দেশ্যেই আসুক না কেন চুক্তির এই শর্ত অনুসারে তাকে প্রত্যর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানানোর অধিকার মুসলমানদের ছিল। কিন্তু ইসলাম আগ্রহী ছিল কেবলমাত্র ঈমানদার নারীদের নিরাপত্তা দান করতে। পালিয়ে আসা সব রকম স্ত্রীলোকের জন্য মদীনাকে আশ্রয় কেন্দ্র বানানো ইসলামের উদ্দেশ্য ছিল না। তাই আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন, যেসব স্ত্রীলোক হিজরত করে আসবে এবং তাদের ঈমানদার হওয়ার কথা প্রকাশ করবে তাদেরকে জিজ্ঞেসাবাদ করে এ বিষয়ে নিশ্চিত হও যে, প্রকৃতই তারা ঈমান গ্রহণ করে এখানে চলে এসেছে। এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পর আর তাদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দিও না। আল্লাহ তা'আলার এ নির্দেশ কার্যকরী করার জন্য যে নিয়ম পদ্ধতি রচনা করা হয়েছিল তা হলো, যেসব স্ত্রীলোক হিজরত করে মদীনায় চলে আসত তাদেরকে এ মর্মে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতো যে, তারা সত্যিই আল্লাহর একত্ব এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে কিনা এবং কেবল আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্যই হিজরত করেছে কিনা? ব্যাপারটা এমন নয়তো যে স্বামীর প্রতি বিরূপ ও বিরক্ত হয়ে রাগে বা অভিমানে ঘর ছেড়ে চলে এসেছে? কিংবা আমাদের এখানকার কোন পুরুষের প্রতি তার ভালবাসা ও অনুরাগ তাকে নিয়ে এসেছে? কিংবা অন্য কোন পার্থিব স্বার্থ তার এ কাজের চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছে? যেসব স্ত্রীলোকেরা এসব প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দিতে পারত শুধু তাদেরকেই থাকতে দেয়া হতো এবং অবশিষ্ট সবাইকে ফিরিয়ে দেয়া হতো। (ইবনে জারীর---ইবনে আব্বাসের বর্ণনার বরাত দিয়ে কাতাদা, মুজাহিদ, ইকরিমা, ইবনে যায়েদ)।

এ আয়াতে সাক্ষ্যদান আইনেরও একটা মুলনীতি ও সূত্র বর্ণনা করা হয়েছে আর তা কার্যকারী করার জন্য রসূলুল্লাহ ﷺ যে কর্মপদ্ধতি ঠিক করে দিয়েছিলেন তা থেকে এর আরো স্পষ্ট ব্যাখ্যা হয়ে গিয়েছে। আয়াতটিতে তিনটি কথা বলা হয়েছে। এক, হিজরাতকারিনী যেসব স্ত্রীলোক নিজেদেরকে ঈমানাদার হিসেবে পেশ করবে তাদের ঈমানের বিষয়টি খোঁজ খবর নিয়ে দেখ। দুই, তাদের ঈমানের প্রকৃত অবস্থা কেবল আল্লাহ তা'আলাই জানেন। তারা প্রকৃতই ঈমান গ্রহণ করেছে কি না তা জানার কোন উপায় বা মাধ্যম তোমাদের কাছে নেই। তিন, যাঁচাই বাছাইয়ের মধ্যে যখন তোমরা জানতে পারবে যে, তারা ঈমানাদার, তাহলে তাদেরকে ফেরত পাঠাবে না। তাছাড়াও এই নির্দেশ অনুসারে ঐ সব স্ত্রীলোকদের ঈমান পরীক্ষা করার জন্য নবী (সা.) যে পদ্ধতি ঠিক করেছিলেন তা ছিল এই যে, সেসব মহিলাদের শপথভিত্তিক বক্তব্য বিশ্বাস করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে যে, তাদের হিজরত করার পেছনে উদ্বুদ্ধকারী শক্তি ঈমান ছাড়া অন্য কিছুই না। এ থেকে প্রথমত যে নীতিটি জানা গেল তাহলো মামলাসমূহের ফায়সালা করার জন্য প্রকৃত ঘটনা কি তা জানা থাকা আদালাতের জন্য জরুরী নয়। বরং সাক্ষ্যের মধ্যে অর্জিত জ্ঞানই এজন্য যথেষ্ট। দ্বিতীয়ত, যে কথাটি জানা গেল তা হলো, কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত আমরা তার শপথ ভিত্তিক বক্তব্যের ওপর বিশ্বাসস্থাপন করব। তৃতীয়ত, যে কথাটি জানা গেল, কোন ব্যক্তি তার আকীদা-বিশ্বাস ও ঈমান সম্পর্কে নিজে যে কথা বলছে আমরা তা গ্রহণ করব এবং সে যা বলছে তার আকীদা-বিশ্বাস সত্যিই তাই কি না তা খুঁজে বেড়াতে শুরু করব না। তবে তার বক্তব্যের বিপরীত কোন স্পষ্ট প্রমাণ যদি আমাদের সামনে প্রকাশ পায় তাহলে ভিন্ন কথা। আর চতুর্থ

আরেকটি কথা হলো, কোন ব্যক্তির যেসব একান্ত ব্যক্তিগত কথা অন্য করো পক্ষে জানা সম্ভব নয় সেসব ব্যাপারে তার নিজের বক্তব্যের ওপর নির্ভর করা হবে। যেমনঃ তালাক ও ইদ্দতের ব্যাপারে এবং মেয়েদের মাসিক ও পবিত্রতার ব্যাপারে তার নিজের বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হবে। এক্ষেত্রে সে সত্য মিথ্যা যাই বলুক না কেন তাতে কিছু এসে যায় না। এ নীতি অনুসারে "ইলমে হাদীস" বা হাদীসশাস্ত্রের ক্ষেত্রেও সেসব বর্ণনা গ্রহণ করা হবে যার বর্ণনাকারীগণের বাহ্যিক অবস্থা তাদের সত্যবাদী হওয়ার প্রমাণ দেয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের কোন বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হওয়ার পথে কোন প্রমাণ বা ইঙ্গিত বাঁধা হয়ে না দাঁড়ায় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বর্ণনাসমূহ গ্রহণ করা হবে।

এর অর্থ হলো, তাদের কাফের স্বামীদেরকে তাদের যে মোহরানা ফেরত দেয়া হবে সেটিই ঐ সব মেয়েদের মোহরানা হিসেবে গণ্য হবে না। বরং এখন যে কোন মুসলমানই তাদের কাউকে বিয়ে করতে চাইবে সে তাকে মোহরানা দিয়ে বিয়ে করবে।

এসব আয়াতে চারটি বড় বড় নির্দেশের উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামের পারিবারিক এবং আন্তর্জাতিক এই উভয় আইনের সাথেই চারটি নির্দেশ সম্পর্কিত।

প্রথম নির্দেশটি হলো, যে স্ত্রীলোক মুসলমান হয়ে যায় সে তার কাফের স্বামীর জন্য হালাল থাকে না আর তার কাফের স্বামীও তার জন্য হালাল থাকে না।

দ্বিতীয় নির্দেশটি হলো, যে বিবাহিতা নারী মুসলমান হয়ে দারুল কুফর থেকে হিজরত করে দারুল ইসলামে আসে তার বিবাহ বন্ধন আপনা থেকেই ছিন্ন হয়ে যায় এবং ইচ্ছা করলে যে কোন মুসলমানই মোহরানা দিয়ে তাকে বিয়ে করতে পারে।

তৃতীয় নির্দেশটি হলো, কোন পুরুষ লোক মুসলমান হয়ে যাওয়ার পর তার স্ত্রী যদি কাফেরই থেকে যায় তাহলে ঐ স্ত্রীকে বিবাহ বন্ধনে আটকে রাখা তার জন্য জায়েয নয়।

চতুর্থ নির্দেশটি হলো, দারুল কুফর ও দারুল ইসলামের মধ্যে যদি সন্ধি চুক্তি বর্তমান থাকে তাহলে কাফেরদের যেসব বিবাহিত স্ত্রী হিজরত করে দারুল ইসলামে চলে এসেছে মুসলমানদের পক্ষ থেকে তাদের মোহরানা ফিরিয়ে দেয়া এবং মুসলমানদের সাথে বিবাহিত যেসব কাফের স্ত্রী দারুল কুফরে রয়ে গিয়েছে তাদেরকে প্রদত্ত মোহরানা কাফেরদের পক্ষ থেকে ফিরে পাওয়ার জন্য ইসলামী সরকারকে দারুল কুফরের সরকারের সাথে বিষয়টির ফায়সালা করার চেষ্টা করতে হবে।

এসব নির্দেশের ঐতিহাসিক পটভূমি হলো, ইসলামের প্রাথমিক যুগে এমন অনেক পুরুষ ছিল যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল কিন্তু তাদের স্ত্রীরা ইসলাম গ্রহণ করেনি। আবার এমন অনেক স্ত্রীলোকও ছিল যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল কিন্তু তাদের স্বামীরা ইসলাম গ্রহণ করেনি। খোদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক মেয়ে হযরত যয়নবের (রা.) স্বামী আবুল আস ছিলেন অমুসলিম এবং কয়েক বছর পর্যন্ত অমুসলিমই রয়ে গিয়েছিলেন। মুসলমান নারীদের জন্য তাদের কাফের স্বামী এবং মুসলমান স্বামীদের জন্য তাদের মুশরিক স্ত্রী হালাল নয় এমন কোন নির্দেশও ইসলামের প্রাথমিক যুগে হয়নি। তাই তাদের মধ্যকার দাম্পত্য সম্পর্ক অব্যাহত ছিল। হিজরাতের পরেও কয়েক বছর পর্যন্ত এ অবস্থা বিদ্যমান ছিল। এ সময় বহু সংখ্যক নারী মুসলমান হওয়ার পর হিজরত করে চলে এসেছিল। কিন্তু তাদের কাফের স্বামীরা দারুল কুফরেই থেকে গিয়েছিল। আবার বহু সংখ্যক মুসলমান পুরুষ হিজরত করে চলে এসেছিল। কিন্তু তাদের কাফের স্ত্রীরা দারুল কুফরেই রয়ে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও তাদের বিবাহ বন্ধন অবশিষ্ট ছিল। এতে বিশেষভাবে মহিলাদের জন্য বড় ধরনের জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছিল। কারণ, পুরুষ তো দ্বিতীয় বিয়েও করতে পারে। কিন্তু মহিলাদের জন্য তা সম্ভব ছিল না। পূর্ব স্বামীর সাথে তার বিয়ে বাতিল না হওয়া পর্যন্ত সে অন্য কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারত না। হুদায়বিয়ার সন্ধির পর এসব আয়াত নাযিল হলে মুসলমান এবং কাফের ও মুশরিকদের মধ্যকার পূর্বের দাম্পত্য সম্পর্ক বাতিল করে দেয়া হয় এবং তাদের ভবিষ্যতের জন্য একটা অকাট্য ও সুস্পষ্ট আইন তৈরী করে দেয়া হয়। ফিকাহবিদগণ এ আইনটিকে চারটি বড় বড় অনুচ্ছেদে সুসংবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত করে দিয়েছেন।

একটি অবস্থা হলো, স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যদি দারুল ইসলামে অবস্থানকারী হয় এবং তাদের একজন মুসলমান হয়ে যায় কিন্তু অপরজন কাফেরই থেকে যায়।

দ্বিতীয় অবস্থা হলো, স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যদি দারুল কুফরে অবস্থানকারী হয় এবং তাদের একজন মুসলমান হয়ে যায় কিন্তু অপরজন কাফেরই থেকে যায়।

তৃতীয় অবস্থা হলো, স্বামী-স্ত্রীর কোন একজন যদি মুসলমান হয়ে দারুল ইসলামে হিজরত করে আসে এবং অপরজন দারুল কুফরে কাফের হিসেবেই থেকে যায়।

চতুর্থ অবস্থা হলো, মুসলমান স্বামী-স্ত্রী কোন একজন যদি মুরতাদ হয়ে যায়।

এই চারটি অবস্থা সম্পর্কে ফিকাহবিদগণের কার কি মত আমরা তা আলাদা আলাদাভাবে নীচে বর্ণনা করেছি। একঃ প্রথম ক্ষেত্রে স্বামী যদি ইসলাম গ্রহণ করে আর স্ত্রী খৃস্টান কিংবা ইহুদী হয় এবং সে তার ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহলে উভয়ের বিবাহ বন্ধন বহাল থাকবে। কারণ মুসলমান পুরুষের জন্য আহলে কিতাব স্ত্রী গ্রহণ করা বা থাকা জায়েজ। এ বিষয়ে সমস্ত ফিকাহবিদ একমত।

আর ইসলাম গ্রহণকারী পুরুষের স্ত্রী যদি আহলে কিতাব না হয় এবং সে তার ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহলে সে সম্পর্কে হানাফিদের বক্তব্য হলোঃ স্ত্রীর কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হবে। সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে বিয়ে বহাল থাকবে। আর যদি সে ইসলাম গ্রহণ না করে তাহলে তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটান হবে। এক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নির্জনবাস হয়ে থাকলে স্ত্রী মোহরানা লাভের অধিকারিনী হবে এবং নির্জনবাস না হয়ে থাকলে মোহরানা লাভের কোন অধিকার তার থাকবে না। কারণ তার অস্বীকৃতির কারণেই বিচ্ছেদ ঘটেছে। (আল মাবসূত, হিদায়া, ফাতহুল কাদীর) ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমাদ বলেনঃ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি নির্জনবাস না হয়ে থাকে তাহলে পুরুষের ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে স্ত্রী তার বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি নির্জনবাস হয়ে থাকে তাহলে তিনবার মাসিক আসা পর্যন্ত স্ত্রী তার বিবাহ বন্ধনে থাকবে। এ সময়ের মধ্যে সে যদি স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে বিয়ে বহাল থাকবে। অন্যথায়, তৃতীয় বার মাসিক থেকে পবিত্র হওয়ার সাথে সাথেই আপনা থেকেই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী (র) একথাও বলেন যে, আমাদের পক্ষ থেকে যিম্মিদেরকে তাদের ধর্মীয় কাজে হস্তক্ষেপ না করার যে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে, তার ভিত্তিতে নারীর কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করাও ঠিক হবে না। কিন্তু বাস্তবে এটা একটা দুর্বল যুক্তি। কারণ একজন যিম্মী নারীকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হলে তখনই কেবল তা তার ধর্ম মতে বাঁধা সৃষ্টি করা বলে গণ্য হবে। তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ কর তাহলে তোমার স্বামীর সাথে থাকতে পারবে অন্যথায় তোমাকে তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হবে, শুধু এই কথাটি তাকে বলা তার ধর্মমতে কোন প্রকার অবৈধ হস্তক্ষেপ নয়। হযরত আলীর (রা.) খেলাফত কালে এ ধরনের একটি ঘটনার নজির পাওয়া যায়। তখন ইরাকের একজন অগ্নিপূজক জমিদার ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু তার স্ত্রী কাফেরই থেকে যায়। হযরত আলী (রা) তার সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন। সে ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালে তিনি তাদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করে দিলেন। (আল মাবসূত) ইমাম মালেক (র) বলেনঃ যদি নির্জনবাস না হয়ে থাকে তাহলে পুরুষের ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে তার কাফের স্ত্রী তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তবে যদি নির্জনবাস হয়ে থাকে তাহলে নারীর কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হবে। সে ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে (আল মুগনী ইবনে কুদামা)।

পক্ষান্তরে স্ত্রী যদি ইসলাম গ্রহণ করে এবং স্বামী কাফের থেকে যায় তাহলে সে আহলে কিতাব হোক বা না হোক এবং উভয়ের নির্জনবাস হয়ে থাক না থাক হানাফীদের মতে সর্বাবস্থায় স্বামীর কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হবে। সে ইসলাম গ্রহণ করলে নারী তার বিবাহ বন্ধনে বহাল থাকে এবং অস্বীকৃতি জানালে কাজী তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবেন। ইসলামের দাওয়াত পেশ করার পর স্বামী যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি না জানাবে ততক্ষণ পর্যন্ত নারী তার স্ত্রী থাকবে ঠিকই কিন্তু স্ত্রীর সান্নিধ্য লাভের অধিকার তার থাকবে না। স্বামীর অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে যে বিচ্ছেদ ঘটবে তা হবে বায়েন তালাক হিসেবে। এমতাবস্থায় নির্জনবাস না হয়ে থাকলে নারী নির্ধারিত মোহরানার অর্ধেক পাওয়ার অধিকারী হবে। আর নির্জনবাস হয়ে থাকলে সম্পূর্ণ মোহরানা লাভের অধিকারী হওয়ার সাথে সাথে ইদ্দতকালীন খোরপোষ লাভেরও অধিকারী হবে। (আল মাবসূত, হিদায়া, ফাতহুল কাদীর) ইমাম শাফেয়ীর (র) মতে, নির্জনবাস না হওয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রীর ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে এবং নির্জনবাস হওয়ার ক্ষেত্রে ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী স্বামীর বিবাহ বন্ধনে বহাল থাকবে। এই সময়ের মধ্যে যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে বিবাহ বহাল থাকবে অন্যথায় ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। কিন্তু নারীর বেলায় ইমাম শাফেয়ীর (র) যে মত ওপরে উদ্ধৃত হয়েছে পুরুষের বেলায়ও তিনি সেই একই মত প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ তার সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা জায়েজ নয়। তবে এ মতটি অত্যন্ত দুর্বল।

হযরত উমরের (রা.) খিলাফতকালে এ ধরনের বেশ কিছু সংখ্যক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। অর্থাৎ নারী ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং পুরুষকে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হয়েছে আর যখন সে ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে তখন দু'জনের মধ্য বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়া হলো। যেমনঃ বনী তাগলেব গোত্রের জনৈকা খৃস্টান স্ত্রীলোকের ব্যাপারটি তার সামনে পেশ করা হলে তিনি স্বামীকে বললেনঃ তুমি ইসলাম গ্রহণ কর। তা নাহলে আমি তোমাদের দু'জনকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে দেব। সে ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে তিনি তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রি দিয়ে দিলেন। বাহযুল মালিকের এক নওমুসলিম জামিদারনীর মামলা তাঁর কাছে পাঠান হলে এ মামালাতেও তিনি নির্দেশ দিলেন যে, তার স্বামীর সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হোক। যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে ভাল কথা। অন্যথায় দু'জনের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটান হোক। সাহাবায়ে কেরামের সামনেই এসব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু কেউ ভিন্নমত পোষণ করেছেন বলে উল্লেখ নেই। (আহকামুল কুরআন জাস্সাস, আল মাবসূত, ফাতহুল কাদীর) এ ব্যাপারে ইমাম মালেকের (র) রায় হলো, স্ত্রী যদি নির্জনবাসের পূর্বেই মুসলমান হয়ে যায় তাহলে স্বামীর সামনে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত পেশ করতে হবে। সে যদি দাওয়াত গ্রহণ করে তাহলে উত্তম। অন্যথায় অবিলম্বে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে। কিন্তু যদি নির্জনবাস হওয়ার পরে স্ত্রীলোকটি ইসলাম গ্রহণ করে থাকে তাহলে ইদ্দতের সময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এই সময়ের মধ্যে স্বামী ইসলাম গ্রহণ করলে বিবাহ বন্ধন ঠিকই থাকবে। অন্যথায় ইদ্দতের সময় শেষ হওয়ার সাথে সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। ইমাম আহমাদের (র) একটি মত ইমাম শাফেয়ীর (র) মতকে সমর্থন করে। তাঁর দ্বিতীয় মত হলো, নির্জনবাস হোক বা না হোক স্বামী এবং স্ত্রীর দ্বীন বা ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়ার সর্বাবস্থায় তাৎক্ষণিক বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ বলে গণ্য হবে। (আল মুগনী)

দুইঃ স্ত্রী যদি দারুল কুফরে ইসলাম গ্রহণ করে এবং স্বামী কাফের থেকে যায় অথবা স্বামী ইসলাম গ্রহণ করে এবং স্ত্রী (যে খৃস্টান বা ইহুদী বরং আহলে কিতাব নয় এমন ধর্মের অনুসারী হয়) তার ধর্ম আঁকড়ে ধরে থাকে এমতাবস্থায় হানাফীদের মতে তাদের নির্জনবাস হোক বা না হোক স্ত্রীর তিনবার মাসিক না হওয়া কিংবা মাসিক রহিতা হয়ে থাকলে তিন মাস অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত বিচ্ছেদ ঘটবে না। এ সময়ের মধ্যে অপরজনও মুসলমান হয়ে গেলে বিবাহ বন্ধন ঠিক থাকবে। অন্যথায় এ সময় শেষ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। এক্ষেত্রেও ইমাম শাফেয়ী (র) নির্জনবাস হওয়া এবং না হওয়ার ক্ষেত্রে পার্থক্য করেন। তাঁর রায় হলো, নির্জনবাস যদি না হয়ে থাকে তাহলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ধর্মের ভিন্নতা সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে বিচ্ছেদ সংঘটিত হবে। আর যদি নির্জনবাস হওয়ার পরে ধর্মের ভিন্নতা দেখা দিয়ে থাকে তাহলে ইদ্দতের সময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে বহাল থাকবে। এ সময়ের মধ্যে যদি অপরজন ইসলাম গ্রহণ না করে তাহলে ইদ্দত শেষ হওয়ার সাথে সাথে বিয়েও বাতিল হয়ে যাবে। (আল মাবসূত, ফাতহুল কাদীর, আহকামুল কুরআন জাস্সাস)

তিনঃ যে ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ধর্মের ভিন্নতা হওয়ার সাথে সাথে দেশও ভিন্ন হয়ে যায় অর্থাৎ তাদের কোন একজন কাফের অবস্থায় দারুল কুফরে থেকে যায় এবং অপরজন হিজরত করে দারুল ইসলামে চলে আসে তাদের সম্পর্কে হানাফীদের বক্তব্য হলো তাদের বিবাহ বন্ধন আপনা থেকেই ছিন্ন হয়ে যাবে। হিজরত করে আগমনকারী যদি নারী হয় তাহলে তার তখনই দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অধিকার থাকে। তাকে কোন ইদ্দত পালন করতে হবে না। তবে স্ত্রীর সাহচর্য লাভ করতে হলে তার গর্ভে সন্তান আছে কিনা তা জানার জন্য একবার মাসিক আসা পর্যন্ত স্বামীকে অপেক্ষা করতে হবে। আর সে যদি গর্ভবতীও হয়

তবুও বিয়ে হতে পারবে। তবে একান্ত নৈকট্য লাভের জন্য সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এ মাসায়ালায় ইমাম আবু ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মাদ ইমাম আবু হানীফার সাথে শুধু এতটুকু ভিন্ন মত পোষণ করেছেন যে, নারীকে ইদ্দত পালন করতে হবে এবং গর্ভবতী হলে সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে হতে পারবে না। (আল মাবসূত, হিদায়া, আহকামূল কুরআন জাসসাস) ইমাম শাফেয়ী (র) ইমাম আহমাদ (র) এবং ইমাম মালেক বলেনঃ এক্ষেত্রে দেশ ভিন্ন ভিন্ন হওয়াতে কিছুই এসে যায় না। বরং এক্ষেত্রে মূল জিনিস হলো ধর্মের ভিন্নতা। যদি স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ধর্মের এই ভিন্নতা সৃষ্টি হয় তাহলে দারুল ইসলামের ধর্মের ভিন্নতা সৃষ্টি হওয়ার ক্ষেত্রে যে বিধান প্রযোজ্য এক্ষেত্রেও সেই একই বিধান প্রযোজ্য হবে। (আল মুগনী)।

হিজরাতকারিনী মুসলমান নারী সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী (র) তাঁর পূর্বোল্লেখিত মতের সাথে সাথে এ মতও প্রকাশ করেন যে, সে যদি তার কাফের স্বামীর সাথে ঝগড়া-বিবাদ করে তার স্বামীত্বের অধিকার রহিত করার উদ্দেশ্যে এসে থাকে তাহলে দেশ ভিন্ন হওয়ার কারণে নয় বরং তার এই সংকল্প ও ইচ্ছার কারণে তাৎক্ষণিকভাবে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটবে। (আল মাবসূত, হিদায়া)।

কিন্তু কুরআন মজীদের আলোচ্য আয়াতটি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এ বিষয়ে ইমাম আবু হানীফার মতই সর্বাধিক বিশুদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি হিজরত করে আগমনকারী ঈমানদার নারীদের সম্পর্কে নাযিল করেছিলেন এবং তাদের ব্যাপারেই বলেছেন যে, তারা তাদের দারুল কুফরে ছেড়ে আসা কাফের স্বামীদের জন্য এখন আর হালাল নয়। আর মোহরানা দিয়ে তাদেরকে বিয়ে করার জন্য দারুল ইসলামের মুসলমানদের অনুমতি দেয়া হয়েছে। অপরদিকে মুহাজির মুসলমানদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, তোমাদের যেসব কাফের স্ত্রী দারুল কুফরে রয়ে গিয়েছে তাদেরকে তোমাদের বিবাহ বন্ধনে আটকে রেখ না। ঐ সব স্ত্রীদেরকে তোমরা যে মোহরানা দিয়েছ কাফেরদের থেকে তা চেয়ে নাও। এটা স্পষ্ট যে, শুধু দ্বীন বা ধর্মের ভিন্নতার কারণে এ নির্দেশ দেয়া হয়নি। বরং যে অবস্থা ও পরিবেশ এসব হুকুমকে বিশেষ রূপ দান করেছে তাহলো দেশের ভিন্নতা। হিজরাতের কারণে কাফের স্বামীদের সাথে মুসলমান মেয়েদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন না হয়ে থাকলে তাদেরকে বিয়ে করার অনুমতি মুসলমানদের কি করে দেয়া যেতে পারে। তাও আবার এমনভাবে যে, এ অনুমতির ক্ষেত্রে ইদ্দত পালনের কোন ইঙ্গিত পর্যন্ত নেই। অনুরূপ لاتمسكوا بعصم الكوافر এর নির্দেশ আসার পরও যদি মুসলমান মুহাজিরদের কাফের স্ত্রীরা তাদের বিবাহ বন্ধনের মধ্যেই থাকত তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এ হুকুমও দেয়া হতো যে, তাদের তালাক দিয়ে দাও। কিন্তু এখানে সেদিকেও কোন ইঙ্গিত দেয়া হয়নি। একথা নিঃসন্দেহে ঠিক যে, এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর হযরত উমর (রা.), হযরত তালহা এবং আরো কিছু সংখ্যক মুহাজির তাদের স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এর দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, এরূপ করা তাদের জন্য জরুরী হয়ে পড়েছিল এবং তাদের স্ত্রীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া না হওয়া তালাক দেয়ার ওপরেই নির্ভর করেছিল। আর তারা তালাক না দিলে ঐসব স্ত্রী তাদের স্ত্রীই থেকে যেত।

এর জবাবে নবীর (সা.) যুগের তিনটি ঘটনাকে নজীর হিসেবে পেশ করা হয়। এ আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার পরও নবী ﷺ দেশের ভিন্নতার কারণে মু'মিন ও কাফের স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ বন্ধন যে ঠিক রেখেছেন এসব ঘটনাকে তার প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়। প্রথম ঘটনাটি হলো, মক্কা বিজয়ের কিছু পূর্বে আবু সুফিয়ান মাররুয, যাহরান (বর্তমান ওয়াদীয়ে ফাতেমা) নামক স্থানে মুসলিম সেনাদলের কাছে এসে সেখানে

ইসলাম গ্রহণ করেন। আর তাঁর স্ত্রী হিন্দ কাফের হিসেবে মক্কায়ই থেকে যায়। মক্কা বিজয়ের পর হিন্দ ইসলাহ গ্রহণ করে। আর বিয়ে নবায়ন না করে নবী ﷺ তাদের পূর্বের বিয়ে বহাল রাখেন। দ্বিতীয় ঘটনাটি হলো, মক্কা বিজয়ের পর ইকরিমা ইবনে আবু জাহল এবং হাকীম ইবনে হিযাম মক্কা থেকে পালিয়ে যান। কিন্তু তাঁদের উভয়ের স্ত্রী তাদের চলে যাওয়ার পর মুসলমান হয়ে যান। এরপর তারা নবীর (সা.) নিকট থেকে তাদের স্বামীর জন্য নিরাপত্তা নেন এবং গিয়ে তাদের নিয়ে আসেন। উভয়েই ফিরে এসে ইসলাম গ্রহণ করলেন। নবী ﷺ তাদেরও পূর্ব বিয়ে বহাল রাখলেন। তৃতীয় ঘটনাটি নবীর (সা.) নিজের মেয়ে হযরত যয়নাবের (রা.)। হযরত যয়নাব (রা.) হিজরত করে মদীনায় চলে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বামী আবুল আস কাফের হিসেবে মক্কায়ই থেকে গিয়েছিলেন। তাঁর সম্পর্কে মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাতে ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়াত হলো, তিনি ৮ম হিজরীতে মদীনায় এসে ইসলাহ গ্রহণ করেন। নবী (সা.) তাদের বিয়েও নবায়ন করেননি বরং পূর্বের বিয়ের ভিত্তিতে নিজের মেয়েকে আবুল আসের স্ত্রী হিসেবে থাকতে দিয়েছেন। এসব ঘটনার মধ্যে প্রথম দু'টি ঘটনা প্রকৃতপক্ষে দেশ ভিন্ন হওয়ার পর্যায়ভুক্ত নয়। কারণ সাময়িকভাবে এক ব্যক্তির একদেশ থেকে অন্য দেশে চলে যাওয়া বা পালিয়ে যাওয়া দেশের ভিন্নতা নয়। কেবল সেই ক্ষেত্রেই দেশের ভিন্নতা হয় যখন কোন ব্যক্তি একদেশ ছেড়ে অন্য কোন দেশে গিয়ে বসতি স্থাপন করে এবং তার ও তার স্ত্রীর মধ্যে বর্তমান কালের পরিভাষা অনুসারে জাতীয়তার (Nationality) পার্থক্য দেখা দেয়। এরপর থাকে কেবল সাইয়েদা যয়নাব রাদিয়াল্লাহ আনহার ব্যাপারটি। এ ব্যাপারে দু'টি রেওয়ায়াত আছে। একটি হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়াত। ওপরে যার বরাত দেয়া হয়েছে। আর দ্বিতীয়টি হযরত আবদুল্লাহ আবনে 'আমর ইবনে আসের রেওয়ায়াত। ইমাম আহমাদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজা এটি উদ্ধৃত করেছেন। দ্বিতীয় এই রেওয়ায়াতটিতে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী ﷺ পুনরায় মোহরানা নির্ধারণ করে নতুনভাবে মেয়েকে আবুল আসের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। যারা স্বামী ও স্ত্রীর দেশ ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার আইনগত প্রভাব অস্বীকার করেন রেওয়ায়াতের এই পার্থক্যের ক্ষেত্রে এই নজীরটি তাদের জন্য প্রথমত অকাট্য দলীল হতে পারে না। দ্বিতীয়ত তারা যদি ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়াতকেই বিশুদ্ধ বলে গুরুত্ব দেন তাহলে তা তাদের নিজেদেরই মতের বিরুদ্ধে চলে যায়। কারণ তাদের মতানুসারে যেসব স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ধর্মের ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে যদি তাদের নির্জনবাস হয়ে থাকে তাহলে স্ত্রীর তিনবার মাসিক হওয়া পর্যন্ত তাদের বিয়ে অক্ষুন্ন থাকে। এই সময়ের মধ্যে অপরজনও ইসলাম গ্রহণ করলে বিবাহ বন্ধন ঠিক থাকে। অন্যথায় তৃতীয় মাসিক আসলে বিবাহ বন্ধন আপনা থেকেই ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু হযরত যয়নাবের যে ঘটনাকে তারা দলীল হিসেবে পেশ করেন তাতে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ধর্মের ভিন্নতা সৃষ্টি হওয়ার পর কয়েক বছর অতিক্রান্ত হয়েছিল। হযরত যয়নাবের হিজরাতের ছয় বছর পর আবুল আস ঈমান গ্রহণ করেছিলেন এবং কুরআনের যে নির্দেশ অনুসারে মুসলমান নারীদেরকে মুশরিকদের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছিল তা তাঁর ঈমান গ্রহণের অন্তত দুই বছর পূর্বে নাযিল হয়েছিল।

চারঃ চতুর্থ বিষয়টি মুরতাদ হওয়া সম্পর্কিত। এর একটি অবস্থা হলো স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই মুরতাদ হয়ে যাওয়া এবং দ্বিতীয় অবস্থা হলো তাদের কোন একজনের মুরতাদ হয়ে যাওয়া আর অপরজনের মুসলমান থাকা।

স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ে যদি একই সাথে মুরতাদ হয়ে যায় তাহলে শাফেয়ী এবং হাম্বলী উলামাদের মতে নির্জনবাসের পূর্বে এরূপ হলে তৎক্ষণাৎ আর নির্জনবাসের পরে হলে ইদ্দতের সময় শেষ হওয়া মাত্র মুসলিম থাকা অবস্থায় যে বিয়ে হয়েছিল তার বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে হানাফীদের মতে, যদিও তাদের বিবাহ

বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাওয়াই সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি ও যুক্তির দাবী কিন্তু হযরত আবু বকরের খিলাফতকালে মুরতাদ হওয়ার যে ব্যাপক ফিতনা দেখা দিয়েছিল তাতে হাজার হাজার মানুষ মুরতাদ হওয়ার পর আবার মুসলমান হয়েছিল। সাহাবায়ে কেরাম তাদের কাউকেই বিয়ে নবায়নের জন্য নির্দেশ দেননি। তাই আমরা সাহাবীদের ঐকমত্য ভিত্তিক এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সাধারণ যুক্তি ও বুদ্ধির বিপক্ষে একথা মেনে নিচ্ছি যে, স্বামী-স্ত্রীর এক সাথে মুরতাদ হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয় না। (আল মাবসূত, হিদায়া, ফাতহুল কাদীর, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবায়া)

স্বামী যদি মুরতাদ হয়ে যায় এবং স্ত্রী মুসলমান থাকে এমতাবস্থায় ইতিপূর্বে তাদের মধ্যে নির্জনবাস হয়ে থাক বা না থাক হানাফী ও মালেকীদের মতে তখনই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু শাফেয়ী এবং হাম্বলীগণ এক্ষেত্রে নির্জনবাসের পূর্বের ও পরের অবস্থার মধ্যে পার্থক্য করে থাকেন। তাদের মতে, নির্জনবাসের পূর্বে যদি এরূপ হয়ে থাকে তাহলে বিবাহ বন্ধন তৎক্ষণাৎ ছিন্ন হয়ে যাবে। আর যদি নির্জনবাসের পরে হয়ে থাকে তাহলে বিবাহ বন্ধন ইদ্দতের সময়-কাল পর্যন্ত অক্ষুন্ন থাকবে। সে যদি এ সময়ের মধ্যে মুসলমান হয়ে যায় তাহলে বিবাহ ঠিক থাকবে। অন্যথায় ইদ্দতের সময় শেষ হওয়ার সাথে সাথে তার মুরতাদ হওয়ার সময় থেকে বিয়ে বাতিল ধরে নেয়া হবে। অর্থাৎ স্ত্রীকে নতুন করে আর কোন ইদ্দত পালন করতে হবে না। চারটি মাযহাবের ফকীহগণ এ বিষয়ে একমত যে, নির্জনবাসের পূর্বে এ ঘটনা ঘটে থাকলে স্ত্রী অর্ধেক মোহরানা এবং নির্জনবাসের পরে ঘটে থাকলে সম্পূর্ণ মোহরানা লাভের অধিকারী হবে।

আর স্ত্রী যদি মুরতাদ হয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে হানাফীদের পুরানো ফতোয়া হলো, বিয়ে তৎক্ষনাৎ বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু পরবর্তীকালে বলখ ও সমরখন্দের আলেমগণ ফতোয়া দিয়েছেন যে, স্ত্রী মুরতাদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহ বিচ্ছেদ হয় না। স্বামীদের হাত থেকে বাঁচার জন্য বা তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য স্ত্রীরা যাতে মুরতাদ হওয়ার পথ অনুসরণ না করেন সেজন্যই তারা এ পন্থার সাহায্য নিয়েছেন। মালিকীদের ফতোয়াও অনেকটা এরূপ। তাঁরা বলেনঃ যদি এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, স্ত্রী কেবলমাত্র স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পন্থা হিসেবে মুরতাদ হয়েছে তাহলে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হবে না। শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের মতে স্বামীর মুরতাদ হওয়ার ক্ষেত্রে যে আইন প্রযোজ্য স্ত্রীর মুরতাদ হওয়ার ক্ষেত্রেও সেই একই আইন প্রযোজ্য। অর্থাৎ নির্জনবাসের পূর্বে মুরতাদ হলে বিয়ে তৎক্ষনাৎ বাতিল হয়ে যাবে। আর নির্জনবাসের পরে মুরতাদ হলে ইদ্দতের সময় অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে ঠিক থাকবে। এ সময়ের মধ্যে সে মুসলমান হয়ে গেলে দাম্পত্য বন্ধন অক্ষুন্ন থাকবে। তা নাহলে ইদ্দতকাল শেষ হওয়ার সাথে সাথে মুরতাদ হওয়ার সময় থেকে বিয়ে বাতিল বলে গণ্য হবে। মোহরানা ক্ষেত্রে এ বিষয়ে সবাই একমত যে, স্ত্রী যদি নির্জনবাসের পূর্বে মুরতাদ হয়ে যায় তাহলে সে মোহরানা আদৌ পাবে না। তবে সে যদি নির্জনবাসের পরে মুরতাদ হয়ে থাকে তাহলে সম্পূর্ণ মোহরানা লাভ করবে। (আল মাবসূত, হিদায়া, ফাতহুল কাদীর, আল মুগনী, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরাবায়া)।

৬ষ্ঠ হিজরীতে যখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাফিরদের সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হন তখন সন্ধির অন্যতম একটি শর্ত ছিল : মক্কা থেকে কোন ব্যক্তি মদীনায় চলে গেলে (যদিও মুসলিম হয়) তাকে মক্কায় ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে। এতে নারী-পুরুষ সবাই শামিল ছিল। কিছু দিন পর কোন কোন মুসলিম মহিলা হিজরত করে মক্কা থেকে মদীনাতে চলে আসে। কাফিররা তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবী জানায়। তখন আল্লাহ তা'আলা মহিলাদেরকে উপরোক্ত শর্তের আওতামুক্ত করে দিলেন। কোন মহিলা হিজরত করে আসলে তাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মু'মিনা জানা গেলে ফেরত দিতে নিষেধ করলেন। আব্দুল্লাহ বিন আবূ আহমাদ হতে বর্ণিত তিনি বলেন : একদা উম্মু কুলসুম বিনতু উকবা (রাঃ) হিজরত করে আসলেন। তার ভাই ওয়ালিদ ও আম্মার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আগমন করে তাকে ফেরত দেওয়ার জন্য আবেদন করল। তখন আল্লাহ তা'আলা মহিলাদের ব্যাপারে চুক্তি ভঙ্গ করে দেন। মহিলাদেরককে মুশরিকদের নিকট ফেরত দিতে নিষেধ করেন এবং এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। (উসদুল গাবাহ ৩/১৭১)

(فَامْتَحِنُوْهُنَّ)

"তাদেরকে পরীক্ষা কর" পরীক্ষা করার অর্থ হল : ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন : তাদের থেকে এ সাক্ষী নেয়া যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া সত্যিকার মা'বূদ নেই, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ তা'আলার বান্দা ও রাসূল। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : পরীক্ষা করার অর্থ হল তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর কী জন্য এসেছে? যদি স্বামীদের প্রতি অসন্তুষ্টি ও রাগ করে চলে আসে তাহলে তাদেরকে তাদের স্বামীদের কাছে ফেরত দাও। ইকরিমা (রহঃ) বলেন : তাদেরকে বলা হবে : আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলের প্রতি ভালবাসা ছাড়া অন্য কোন কারণে আসনি তো? কোন ব্যক্তির ভালবাসায় আসনি তো? স্বামীর প্রতি রাগ করে আসনি তো? মোটকথা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার রাসূলের ভালবাসায় দীন রক্ষার্থে যদি এসে থাকে তাহলে তাদেরকে ফেরত দিয়ো না। কারণ তারা মু'মিনা হওয়াতে কাফিরদের জন্য স্ত্রী হিসাবে থাকা জায়েয নেই। তারাও মু'মিনা মহিলাদের স্বামী হিসাবে বৈধ নয়। যদিও ইসলামের প্রাথমিক যুগে বৈধ ছিল। যেমন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কন্যা জায়নাব (রাঃ)-এর আবূল আসের সাথে বিবাহ হয়েছিল। জায়নাব (রাঃ) ছিলেন মু'মিনা আর আবূল আস ছিল কাফির। বদর যুদ্ধে আবূল আস বন্দী হলে জায়নাব তাঁর মা খাদিজার কাছ থেকে প্রাপ্ত হার বন্দীর মুক্তিপণ সরূপ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে প্রেরণ করেন। হারটি দেখে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খুব নরম হয়ে যান। মুসলিমদেরকে বললেন : যদি তোমরা আমার কন্যার বন্দীকে মুক্তি দেওয়া পছন্দ কর তবে তাকে মুক্ত করে দাও। মুসলিমরা মুক্তিপণ ছাড়াই আবূল আসকে মুক্তি করে দিতে সম্মত হন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে আযাদ করে দিয়ে বলেন : জায়নাবকে মদীনায় পাঠিয়ে দেবে। আবূল আস পাঠিয়ে দেন। পরবর্তীতে আবূল আস ইসলাম গ্রহণ করলে পূর্বের বিবাহের উপরেই নতুন মোহর ছাড়াই তার হাতে জায়নাবকে তুলে দেন। (আবূ দাঊদ হা. ২২৪০, তিরমিযী হা. ১১৪৩ সনদ সহীহ)।

উরওয়াহ হতে বর্ণিত তিনি বলেন : নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সহধর্মিণী আয়িশাহ (রাঃ) তাকে বলেছেন : কোন মু'মিন মহিলা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে হিজরত করে এলে

তিনি তাকে আল্লাহ তা'আলার এ আয়াতের 'হে মু'মিনগণ! তোমাদের নিকট মু'মিন নারীরা হিজরত করে আসলে তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা কর' ভিত্তিতে পরীক্ষা করতেন।

(وَاٰتُوْهُمْ مَّآ أَنْفَقُوْا)

অর্থাৎ তাদের কাফির স্বামীরা তাদেরকে যে মোহর দিয়েছিল তা তোমরা তাদেরকে ফিরিয়ে দাও।

(وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ)

অর্থাৎ যে সকল নারীরা দীন রক্ষা করার জন্য হিজরত করে তোমাদের নিকট চলে এসেছে তাদের বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ। তবে শর্ত হল : ১. মোহর দিতে হবে, ২. ইদ্দত পূর্ণ করতে হবে, ৩. অভিভাবকদের সম্মতি ও দুজন সাক্ষী থাকা লাগবে।

عصم- (وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ)

শব্দটি عصمة এর বহুবচন। এখানে অর্থ হল : দাম্পত্য সম্পর্ক। অর্থাৎ যদি স্বামী মুসলিম হয়ে যায় এবং স্ত্রী কাফির অথবা মুশরিক থেকে যায় তাহলে এ রকম মুশরিক মহিলাকে বিবাহ বন্ধনে রাখা বৈধ না। স্বামী তাকে ত্বালাক দিয়ে পৃথক হয়ে যাবে। এ নির্দেশের পর উমার (রাঃ) তাঁর দু'জন মুশরিক স্ত্রীকে এবং তালহা ইবনু ওবায়দুল্লাহও তাঁর স্ত্রীকে ত্বালাক দিয়ে দেন। (ইবনু কাসীর)।

তবে স্ত্রী আহলে কিতাব হলে ত্বালাক দেওয়া জরুরী নয়, কারণ তাদের সাথে বিবাহ বন্ধন বৈধ।

(وَاسْأَلُوْا مَآ أَنْفَقْتُمْ)

অর্থাৎ যে সকল কাফির স্ত্রীরা কুফরীর ওপর বহাল থেকে কাফিরদের কাছে চলে গেছে তাদের জন্য যা ব্যয় করেছ তা চেয়ে নাও। আর কাফির পুরুষেরা যেন চেয়ে নেয় ঐ সকল স্ত্রীদের থেকে যারা ইসলাম গ্রহণ করত হিজরত করে চলে এসেছে।

(فَعَاقَبْتُمْ) "তোমরা শাস্তি দাও অথবা প্রতিশোধ নাও" এর একটি অর্থ হল : মুসলিম হয়ে আগমনকারী মহিলাদের প্রাপ্ত মোহর যা তোমাদেরকে তাদের কাফির স্বামীদেরকে দিতে হত সেটা তোমরা সেই মুসলিমদেরকে দিয়ে দাও যাদের স্ত্রীরা কাফির হওয়ার কারণে কাফিরদের কাছে চলে গেছে এবং মুসলিমদের

মোহরের পাওনা ফেরত দেয়নি (অর্থাৎ এটাও এক প্রকার সাজা)। দ্বিতীয় অর্থ হল : তোমরা কাফিরদের সাথে জিহাদ কর। অতঃপর যে গনিমতের মাল অর্জন কর, তা থেকে বন্টনের পূর্বে প্রথমে যে মুসলিমদের স্ত্রীরা চলে গিয়ে কাফিরদের দলে মিলিত হয়েছে তাদের ব্যয়কৃত অর্থের সমপরিমাণ তাদেরকে দিয়ে দাও। অর্থাৎ গনিমতের মাল থেকে মুসলিমদের ক্ষতি পূরণ করাটাও এক প্রকার শাস্তি বা প্রতিশোধ। (আয়সারুত তাফাসীর, ইবনু কাসীর)। যদি গনীমতের মাল থেকে ক্ষতিপূরণ সম্ভব না হয়, তাহলে বাইতুল মাল থেকে সাহায্য করা হবে।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয় :

১. মুসলিম মহিলাদের কাফির পুরুষদের সাথে বিবাহ বন্ধন বৈধ নয়।

২. মুসলিমরা আহলে কিতাবের নারীদের বিবাহ করতে পারে।

৩. কোন মহিলা কাফির দেশ থেকে হিজরত করে চলে আসলে তাকে পরীক্ষা করে জেনে নেয়া দরকার যে, প্রকৃতপক্ষে সে ইসলামের স্বার্থে হিজরত করেছে কিনা।

৪. মুসলিমরা আল্লাহ তা'আলার আদেশ জানা মাত্রই তার কাছে মাথা নত করবে। যেমন উমার (রাঃ) ও তালহা (রাঃ) মুশরিকা নারীর সাথে বিবাহ বন্ধন হারাম হওয়ার কথা জানার সাথে সাথে ত্বালাক দিয়ে দেন।